(Abstract)
গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের পথচলা সহস্রাধিক বর্ষ ধরে চলে আসছে। আর এই হাজার বছর ধরে বাঙালির ধ্যান ও সাধনা প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যের পাতায়। আবার সাহিত্য যখন সমাজের দর্পণ, তখন সমাজের বাস্তবিক রূপও ধরা পড়ে সাহিত্যের পাতায়। এই কারণে তুর্কী বিজয়ের অভিঘাতে বাঙালি জাতি যখন দিশেহারা ও পর্যদুস্ত এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পটভূমি যখন তমসাচ্ছন্ন তখন পঞ্চদশ শতকের শেষে নবজাগরণের পুরোধা মানবতার মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশ ও বাঙালির সমাজ-জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাঙালির চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল, চৈতন্যদেব যেন তারই ঘনীভূত নির্যাস। বাংলাদেশ ও বাঙালির সমাজ-জীবনে যখন চরম অস্থিরতা, পরাজয়, অপমান, টিকে থাকবার আশায় বিপর্যস্ত ভাব, মানুষের মনুষ্যত্ব যখন ভূলুণ্ঠিত, ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের প্রবল স্রোতে হিন্দু সমাজ যখন বিপন্ন, তখন আদ্বিজচণ্ডালে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণনামের প্রেমে মাতোয়ারা করে জাতিকে নতুনভাবে বাঁচবার স্বপ্ন দেখালেন যিনি— তিনি হলেন বৃহৎ মানবতার আদর্শস্বরূপ যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্য।

মূলত, মধ্যযুগে 'রেনেসাঁ' কথাটি কষ্টকল্পিত হলেও চৈতন্যদেব তাঁর একক ব্যক্তিত্ব ও সাধনার মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জগতে যে অভূতপূর্ব-আলোড়ন তুলেছিলেন, তাকে 'চৈতন্য-রেনেসাঁ' নামে আখ্যা দিতে কোন কষ্টকল্পনার সাহায্য নিতে হয় না। যুগাবতার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও তাঁর পুণ্য পাদস্পর্শে নবদ্বীপ তথা বঙ্গদেশ ধন্য হয়েছিল। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তাই এই সময়কালটি 'চৈতন্যযুগ' নামে চিহ্নিত। 'চৈতন্যযুগ' তাই স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির নবজাগরণের প্রারম্ভিক পর্ব। সেন রাজবংশের প্রশয়পুষ্ট ও আশীর্বাদধন্য একটি অভিজাত সম্প্রদায় যখন দেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত, বর্ণ বিভক্ত হিন্দু সমাজে ভেদবুদ্ধি যখন প্রবল ও প্রকট তখন মহামানব চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৃহত্তর বাঙালি সমাজ গঠনের পক্ষে এক অত্যন্ত আবশ্যক ও অনস্বীকার্য রূপেই প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। একই ঐক্যসূত্রে তিনি বাঁধতে চেয়েছিলেন নবদ্বীপের উচ্চ অভিজাত এবং উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাংলার অন্ত্যজ সমাজকে। তাঁর দৃষ্টিতে রূপ গোস্বামী ও যবন হরিদাস সমমর্যাদাবান। অবশ্য স্বীকার্য যে, কোন সমাজতাত্ত্বিক কিংবা রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কিন্তু চৈতন্যদেব একাজে ব্রতী হন নি। তবুও বাঙালি নামক একটি জাতির গঠন পর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে তাঁর দান ও প্রভাবকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। চৈতন্যদেব প্রচারিত সমন্বয়ের বাণীকে

আধুনিক অর্থে 'Humanism'- বলতে অবশ্য বাধা থাকতে পারে, তবে একথা বলতে বাধা নেই যে, তথাকথিত 'Humanist'-রা যে কাজ সংঘবদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি, চৈতন্যদেব তাঁর একক প্রয়াসে ও প্রভাবে সেই কাজ অনেক সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বিষ্ট সমাজে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব ও আশ্চর্য পথের তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে পারে এবং সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অভিনন্দিত ও আখ্যায়িত হতে পারে চৈতন্যদেবের পূর্বে সেকথা উচ্চারণ করাও অকল্পনীয় ছিল তৎকালীন সমাজে। অনেক পরবর্তীকালে মহাত্মাগান্ধী যাঁদের হরিজন বলে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জ্ঞাপন করেছিলেন, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মহামানব চৈতন্যদেবই তার প্রথম প্রবক্তা।

এই মহামানব চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনলীলা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তিনি একান্তই যুগোপযোগী বাস্তববাদী মহামানব ছিলেন। খোল-করতাল সহযোগে সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার আপামর জনসাধারণকে শুধু ঐ যুগের রাজধর্মের ভীতি থেকে রক্ষা করেন নি, জাতিভেদকে দূর করে এক নতুন সমাজ-সংস্কৃতির আদর্শও সৃষ্টি করেছিলেন। কেবলমাত্র ধর্ম নয়, চৈতন্যযুগে সাহিত্য-সংস্কৃতি, সংগীত, বাস্তব শিল্পবোধ প্রভৃতির মাধ্যমে 'চৈতন্যযুগ' বিশিষ্টতা অর্জন করে। এককথায় বাঙালির জনমানসে ও ইতিহাসের কালক্রমে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই নবযুগের স্রষ্টা ছিলেন চৈতন্যদেব।

আমরা জানি, মহামানব চৈতন্যদেব তাঁর জীবৎকালেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের দ্বারা ঈশ্বরত্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অবশ্য কোন ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখলেই তার উপর দেবত্ব আরোপ করার প্রবণতা মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী থেকে চৈতন্য মতবাদ ও তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে চৈতন্যদেবের মানবপ্রেম, সমাজ সংস্কার, সাম্যবাদী ও প্রতিবাদী চিন্তা ভাবনার দিকগুলি আলোচিত হতে থাকে। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভগবান চৈতন্যের চেয়ে মানবপ্রেমিক চৈতন্যকেই মানুষ বেশি পছন্দ করে। কারণ, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসাই ছিল চৈতন্য মতাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভক্তি আন্দোলন মানব জীবনকে ঋদ্ধ ও অর্থবহ করে তোলার জন্যই। জীবনকে অস্বীকার করে নয়, জীবনকে ভালোবেসে জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ সাধন করাই ছিল তাঁর সাধনা। আর এই কারণে আজও চৈতন্যদেব আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক— ভবিষ্যতেও থাকবেন।

আজ প্রায় পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চৈতন্যজীবনী সাহিত্য গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। অথচ চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা, পারস্পরিক তুলনা এবং চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে যে পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবন-দর্শন অন্বেষণের প্রচেষ্টা— তা প্রায় গবেষকদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে গেছে। আবার চৈতন্যজীবনী সাহিত্য গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে উঠে আসা তৎকালীন সমাজ জীবনের বাস্তব প্রামাণিক চিত্রায়ণের প্রতিচ্ছবিও আমরা প্রায় পাই নি বললেই চলে। শুধু তাই

নয়, বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান দুই চৈতন্যজীবনী কাব্যের— বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'— নিরিখে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণের প্রচেষ্টাও প্রায় নেই বললেই চলে। তাই মহামানব চৈতন্যদেব সম্পর্কিত এই অনালোচিত দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে মূল আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

প্রথম অধ্যায়
চৈতন্যজীবনী কাব্যের পরিচয় সংক্ষেপ

একটি জীবন জীবনী হয়ে ওঠে জীবনের পরিপূর্ণতায়, জীবন মাহাত্ম্যে। আর জীবনীর বীজ উপ্ত হয় জীবনের অসাধারণত্বে। তাই এককথায় জীবনীগ্রন্থ হল মানব জীবনের উজ্জ্বল উদ্ধার। ইংরেজিতে জীবনী সংক্রান্ত দু'টি শব্দ আছে— ১. Hagiography; ২. Biography। Hagiography হল তাই— যেখানে কোন মহাপুরুষ কিংবা সন্ত-সাধককে কেন্দ্র করে জীবনী রচিত হয়। আর যে কোন সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে রচিত জীবনীই হল Biography। এছাড়াও কোন জীবনীকার যখন নিজের অণুপুঙ্ক্ষ জীবন সংক্রান্ত গ্রন্থ নিজেই প্রণয়ন করেন তখন তাকে Auto-Biography বলে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি Hagiography বা মহাপুরুষের জীবনীর অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাই প্রথম চোখে দেখা ব্যক্তি মানুষের জীবন-কথা হল চৈতন্যজীবনী গন্থগুলি। দেবতা নয়, ধর্ম নয়, তত্ত্ব নয়, সাহিত্যের বিষয় হল এক বিস্ময়কর জীবন। এই জীবন অবশ্য জন্মাবধি অসাধারণ। রূপে, মেধায়, আত্মপ্রত্যয়ে, নেতৃত্বে, বৈবাহিকতায়, সামাজিক কৃত্যে, ব্যবহারে, পাণ্ডিত্যে, ঈশ্বর-ব্যাকুলতায়— এককথায় সর্বক্ষেত্রেই অসাধারণ ছিলেন মহামানব চৈতন্যদেব।

আমরা জানি, জীবিতকালেই চেতন্যদেব গৌড়ে অবতাররূপে পূজিত হয়েছিলেন। আর তাঁর শেষ জীবন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কেটেছে নীলাচলে। আবার তিনি নিজে কোন ধর্ম বা মত প্রচার করেন নি ঠিকই, তবে তাঁর তিরোধানের কিছু পূর্ব-থেকেই ভক্তের দল তাঁর আলোকসামান্য ভগবৎ জীবনকথা আলোচনা করতে থাকেন। এভাবে চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃতে একাধিক কাব্য ও নাটক রচিত হয়েছে। তবে, কেবল সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাতেই নয়, বাংলার বাইরে ওড়িয়া ভাষাতেও তাঁর জীবনী সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। অবশ্য এই সমস্ত ওড়িয়া ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য ও নাটককে কোন কোন সমালোচক যথার্থ মর্যাদা দিতে কিছুটা কুণ্ঠিত বলেই মনে হয়। তাই চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করে এই অধ্যায়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি—

ক. সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য ঃ

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে যে বিশেষ কাব্যগুলি এই অধ্যায়ে

আলোচিত হয়েছে, সেগুলি হল—

১. মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'।

২. কবিকর্ণপূর বা পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচরিতামৃতম্', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'।

৩. প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'।

খ. বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য ঃ

মহামানব চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় রচিত যে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, সেগুলি হল—

১. বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'।

২. লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল'।

৩. জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'।

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

৫. গোবিন্দদাসের 'কড়চা'।

৬. চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়'।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণ

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যই সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, জনপ্রিয় ও কাব্যগুণান্বিত। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর এই কাব্যটিতে সুপ্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে চৈতন্যজীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূলত, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের নিগূঢ় আলোচনা অপেক্ষা চৈতন্য-জীবন কাহিনিকেই বাস্তব তথ্য সহকারে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন কবি। আর তাই বাংলার বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যভাগবত'-এর মত এত জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নেই।

সত্যিই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি পাঠ করলে বোঝা যায়, এই গ্রন্থটির ভাব সহজ-সরল, পরিচ্ছন্ন ও সর্বচিত্তাকর্ষী। আসলে কবি এই কাব্যটিতে লৌকিক ও অলৌকিকতার সমন্বয়ে চৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে চিত্রিত করলেও মানুষ চৈতন্যকে খুঁজে পেতে আমাদের তেমন অসুবিধা হয় না। আবার ষোড়শ শতাব্দীর তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ-পরিবেশ বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যটিতে যে পরিমাণে ও যেমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে— তা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের

আর কোনও রচনায় তেমনভাবে প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয় না। আবার চৈতন্যদেবের মানবমূর্তি ও ভগবৎমূর্তি— এই উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত করেছেন বৃন্দাবন দাস। কিন্তু এই কাব্যে চৈতন্যদেবের ভগবৎ মূর্তির অন্তরালে যে মানবীয় মূর্তি রয়েছে— তা সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে।

শুধু তাই নয়, চৈতন্যভাগবত' কাব্যটিতে কবি বৃন্দাবন দাসের কবিত্বশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাও বেশ প্রশংসনীয়। আসলে বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুণ বেদনাময় আবেগ-ব্যাকুলতা কিংবা উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহারের দিক দিয়েও কবি এই কাব্যটিতে প্রথম শ্রেণির কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি শুধুমাত্র মহাপুরুষের জীবনালেখ্য হয় নি, কবির বর্ণনায় সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর এই কারণেও 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হয়। তবে, প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, যেহেতু বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির সঙ্গে পরবর্তী কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের পারস্পরিক তুলনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ চৈতন্য-জীবন-দর্শন অন্বেষণই আমার গবেষণাকর্মের মূল আলোচ্য বিষয়, তাই গবেষণাকর্মের প্রয়োজনার্থে বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যটি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণ

বাংলাদেশের পরম সৌভাগ্য যে, মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত একজন দার্শনিক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। পাণ্ডিত্য, মনীষা, দার্শনিক ভূয়োদর্শন, রসশাস্ত্রে অগাধ অধিকার প্রভৃতি বিবেচনা করলে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে কেবল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নয়, ভারতীয় সাহিত্যেও তুলনাহীন মনে হয়। নিছক চৈতন্যদেবের বস্তুগত তথ্যগত ও ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জি সঙ্কলন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনির পুনরাবৃত্তি না করে চৈতন্য-জীবনাদর্শ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদী দার্শনিক চিন্তার গৌড়ীয় ভাষ্য ও বৈষ্ণব মতাদর্শকে সুসংহত, দূরাভিসারী ও মনন-নিষ্ঠ আকার দিয়ে বাঙালি মনীষার এক স্মারক চরিত্র হয়ে আছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলত দার্শনিক কবি, শুধু বিবৃতিমূলক জীবনীকার নন। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যটি জীবনী ও দর্শনের যুগপৎ সমন্বয়ে এক অপরূপ জীবনীকাব্য হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই কাব্যটি মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত— **ক.** আদিলীলা (সতেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত), **খ.** মধ্যলীলা (পঁচিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত), **গ.** অন্ত্যলীলা (কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত)। 'আদিলীলা'র সতেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কিশোরকাহিনি সূত্রাকারে

বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে মূলত চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা থেকে প্রথম চব্বিশ বছরের জীবনকথা সংক্ষিপ্তাকারে স্থান পেয়েছে। আর প্রথম থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কবি মূলত বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা এবং চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অনুচর পরিকর ও শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর মধ্যলীলায় মোট পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে। সুতরাং এই পর্বটি প্রথম পর্ব থেকে কিছুটা দীর্ঘ। কাহিনির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ, রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত-যাত্রা, রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনা, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, পরে বৃন্দাবনে যাত্রার আগে রাঢ়দেশে পুনরায় আগমন, গৌড় থেকে বৃন্দাবনে যাত্রা, কাশীতে কিছুকাল অবস্থান, প্রত্যাবর্তনের পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মিলন এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। এই মধ্যলীলায় কৃষ্ণদাস বিস্তারিত আকারে গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত এই অংশে কবি মননশীল ও দার্শনিক ঋদ্ধতার দ্বারা বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক দর্শন সম্পর্কে যা বলেছেন, তাই পরবর্তীকালে বৈষ্ণবীয় ধর্ম, তত্ত্ব ও সমাজকে সংহত আকার দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

আর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর অন্ত্যলীলা কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই অন্ত্যলীলাকে সুবিস্তৃত আকারে বর্ণনা করাই ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্য প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অন্ত্যলীলার কুড়িটি পরিচ্ছেদের মধ্যে শেষের সাতটি পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর প্রথম থেকে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বর্ণিত অংশে চৈতন্যজীবনীর কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ থাকলেও শেষ অধ্যায়গুলিতে ঘটনা অপেক্ষা চৈতন্যদেবের প্রেমাবেগই প্রধান হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণবিরহে চৈতন্যদেব তাঁর শেষজীবন চেতন ও অবচেতন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এই শেষ জীবনের সূক্ষ্ম-মনস্তত্ত্ব, কৃষ্ণের প্রতি তদেকাত্ম আবেগ অনুভূতি ও কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর সমস্ত সত্তার এই সময় যে বিলুপ্তি ঘটেছিল, তা বর্ণনার জন্য প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার প্রয়োজন। আর কৃষ্ণদাস ছিলেন সেই দুর্লভ কবি প্রতিভার অধিকারী। কারণ যা ব্যাখ্যাতীত, সূক্ষ্মতম ও অবর্ণনীয়— চৈতন্যদেবের সেই দিব্যোন্মাদ মহাভাবকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আশ্চর্য তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মচেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, যেহেতু কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই কাব্যটিতে যে চৈতন্যজীবন-দর্শন পরিস্ফুট হয়েছে তার সামগ্রিক চিত্রের অন্বেষণ এবং এই কাব্যটির সঙ্গে পূর্ববর্তী চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের পারস্পরিক তুলনার নিরিখে সম্পূর্ণ চৈতন্য-জীবন দর্শন রূপায়নই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়, তাই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনার্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই মহাগ্রন্থটি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে অণুপুঙ্ক্ষ আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ ঃ পরিপূরকতার নিরিখে

মহামানব চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করে বহু জীবনীগ্রন্থ বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা ও প্রচারের ব্যাপকতায় বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ সর্বশ্রেষ্ঠ। ‘চৈতন্যভাগবত’ হল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ। আর এই কাব্যের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশক্রমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। লক্ষণীয়, এই দু’টি কাব্যেই চৈতন্যদেবের জীবনকথা আলোচিত হলেও উভয় কবির কবিত্বশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য তাঁদের অঙ্কিত জীবনচিত্রের মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। তবে কেবল এই তত্ত্বগত ও তথ্যগত প্রভেদই উভয় কাব্যের মূল উপজীব্য নয়। চৈতন্যদেবের অনির্বচনীয় ও অনিরূপণীয় ব্যক্তিত্বকে বৃন্দাবন দাস যেখানে ঘটনার পর ঘটনার সংযোজনে একান্ত ঘরোয়া রূপ-চিত্রকে অঙ্কন করেছেন, সেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঘর ও বহির্বিশ্বকে একত্র করে সম্পূর্ণ চৈতন্যজীবনের মহিমাকে ব্যক্ত করেছেন বলেই মনে হয়। আর তাই বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যে চিত্রিত চৈতন্যদেব অনেক বেশি বাঙালি ঘরের সন্তান হয়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যে চৈতন্যদেবের যেন সর্বভারতীয় এক রূপের আভাস পাওয়া যায়।

তবে, চৈতন্যদেবের এই গৃহগত ও বিশ্বগত রূপ-চিত্রের মধ্যে স্বরূপত কোন প্রভেদ নেই বলেই মনে হয়। আর এই কারণে বৃন্দাবন দাসের বাঙালি গৃহের সন্তান গৌরাঙ্গ যেন অতি সহজেই কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ রূপ লাভ করেছে। সুতরাং পরিপূর্ণভাবে চৈতন্য-জীবন-দর্শন ও সমাজকে জানতে হলে ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘চৈতন্যচরিতামৃত’— উভয় গ্রন্থই প্রয়োজন। আর এই কারণেই উভয় জীবনী গ্রন্থ যে পরস্পর পরিপূরক— তাই এই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহার

বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’— এই উভয় চৈতন্যজীবনী গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই যে সম্পূর্ণ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণ করা সম্ভব এবং উভয় গ্রন্থই যে পরস্পর পরিপূরক— এই সিদ্ধান্তের নিরিখেই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির উপসংহার নির্ণীত হয়েছে।